Vol. 54 | No. 3 | 2017

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

চর্যার সুরের উৎস-সন্ধান

Volume	54
Issue	3
Year	2017
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Sayeem Rana
Published online	June 1, 2017
DOI	10.62328/sp.v54i3.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v54i3.3
Pages	49-76
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

চর্যার সুরের উৎস-সন্ধান

সাইম রানা *

অ্যাবস্ট্রাক্ট : চর্যাগীত বাঙালির প্রাচীন ভাষা ও সংস্কৃতির প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে শতবর্ষজুড়ে সাহিত্য-ভাষা ও দর্শনচর্চায় গুরুত্ব পেয়ে আসছে। চর্যার গবেষণার মধ্যদিয়ে বাঙালির আত্মপরিচয়ের নতুন নতুন দিক উন্মোচন করা সম্ভব। চর্যাসুর ও সংগীত তার মধ্যে প্রাধান্য পাবে, কারণ চর্যা একটি পরিবেশনাশিল্প ও প্রতিটি চর্যার সাথে রাগের নাম উল্লেখ করা রয়েছে। কিন্তু এই সূত্র ধরে এখনো চর্যাপরিবেশনার তৎকালীন সুরের কোনো যথার্থ নিদর্শন পাওয়া যায়নি। প্রচলিত রাগের নিদর্শন ও বৌদ্ধস্তোত্রের প্রাচীন স্বরলিপির অস্তিত্ব এখনো এদেশে এবং বহির্বিশ্বে প্রচলিত রয়েছে, তা থেকে বাঙালির প্রাচীন সুরের ঐতিহ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব, সেই নিদর্শন এই প্রবন্ধে যুক্ত করা হয়েছে। চর্যাকাল এমনকি তার পূর্বকালেও এই ভূখণ্ডে অন্যান্য সাহিত্য ও সংগীতের নিদর্শন ছিল সে-সম্পর্কেও এখানে কিছু অনুসন্ধানমূলক তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

চর্যাসংগীতের মধ্যে প্রধান দুইটি দিক লক্ষ্যণীয়; একটি দর্শনগত, অন্যটি সাধনার[১] পন্থা। এর মধ্যে দ্বিতীয় দিকটিরই প্রাধান্য রয়েছে – কেননা চর্যার রচয়িতাগণ মূলত সাধক এবং চুরাশি সিদ্ধাচার্যের মধ্যে গণ্য। এই গীত পরিবেশিত হলেও তা শুধুই পরিবেশনার উদ্দেশ্যে বা মনোরঞ্জনের জন্য গীত হতো না, বরং তা সাধনার ঊর্ধ্বলক্ষে পৌঁছানো কিংবা শিক্ষার্থীকে সাধনার পথ-নির্দেশনায় ব্যবহৃত হতো। একারণে চর্যাগীতিকে ‘conduct’ বা ‘Song of realisation’ বা উপলব্ধির গান বলা হয়ে থাকে। সেই প্রক্রিয়ায় সুরকে প্রতিষ্ঠিত করার অপেক্ষা ভাবপ্রকাশের মাধ্যম/অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করা হতো। প্রাচীন মতে তাই এগুলোকে ‘শব্দবিদ্যা’ বলা হতো, আবার প্রাচীন সুরের তথ্যমতে সুর ছিল কথা ও বক্তব্যের চিত্রায়ণ। ধ্যানের গভীরতায় প্রবেশের জন্য ধ্বনির বিস্তারণ — অনেকটা মন্ত্রপাঠের মতো। বাঙালি গবেষকদের মতে চর্যার সুর ছিল দেশিগানের ধারায় বিকশিত। কারণ

*সহকারী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

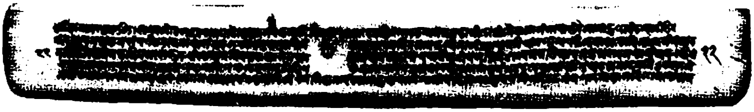

এই বঙ্গের মানুষেরা আদি-অনার্য এবং অনভিজাত দেশীগানেরই উত্তরাধিকারী—যা এক স্বর থেকে চার স্বরের মধ্যে সীমিত ছিল।[২]

দেশিগান বলতে বোঝায় দেশে দেশে বা অঞ্চলভেদে সেই দেশের বা ভূখণ্ডের ভাষা, যা সুর, বাদ্য ও নৃত্য সহযোগে সেখানকার অধিবাসীদের অভিরুচি অনুযায়ী স্বতন্ত্র স্বরভঙ্গি ও চলনে গড়ে ওঠে। এ বিষয়ে মতঙ্গের[৩] (৫ম-৬ষ্ঠ শতক) *বৃহদ্দেশী* গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'এক স্বর থেকে চার স্বরযুক্ত গানগুলি মার্গশ্রেণীভুক্ত নয়, তারা ছিল দেশি। শবর, পুলিন্দ, কম্বোজ, বঙ্গ, কিরাত, অন্ধ্র, দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতির মধ্যে চার স্বরযুক্ত অনভিজাত দেশীগানের প্রচলন ছিল' (প্রজ্ঞানানন্দ, ১৩৫৯ : ৩-৪)। উল্লেখ্য, ভারতীয় সংগীতের প্রাচীন ইতিহাস অন্বেষণ করলে প্রথমে যে বিষয়টি মুখ্য হয়ে ওঠে তা আর্য এবং অনার্য প্রসঙ্গ এবং তাদের সাংগীতিক প্রভাব। দেশিগান মূলত অনার্য জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল।

বর্তমানকালে চর্যাযুগের অনেক রাগ-রাগিণীই প্রচলিত আছে। তার আদি পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হলে হাজার বছর আগে এই বঙ্গীয় ভূখণ্ডের সাংগীতিক পরিবেশ কেমন ছিল তা পরিদৃশ্যমান করা যেতো। আরেকটি দিক লক্ষ্যণীয়, অধিকাংশ চর্যাই কয়েকটি বিশেষ রাগের আশ্রয়ে গাওয়া হতো। তন্মধ্যে সর্বাধিক (বারটি) পদ পটমঞ্জরী রাগেই। একইভাবে শবর, বঙ্গাল, ভৈরব ইত্যাদি রাগগুলোও বঙ্গ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বলে নামকরণের মধ্যে আভাস পাওয়া যায়। চর্যার আদিসুরের

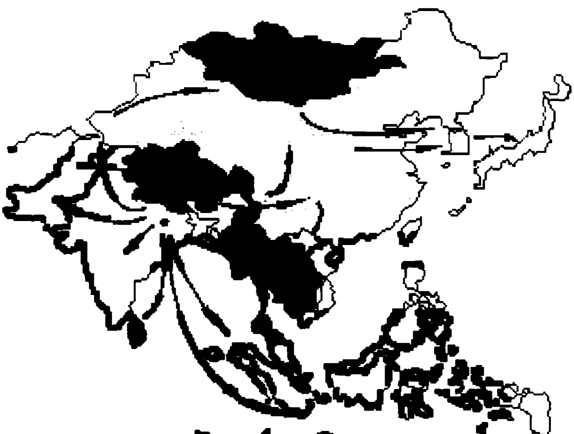

বৌদ্ধধর্মের বিস্তার

বৈশিষ্ট্য বাঙালির সংগীত ইতিহাসের উৎস-নির্ধারণে এক গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। বর্তমানে নেপাল, তিব্বতসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মহাযানী, বজ্রযানী, সহজযানী, মন্ত্রযানীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ধারার অনুসারীগণ, বিশেষ করে তান্ত্রিক ও মন্ত্রচারীদের মাঝে চর্যাগীত এবং নৃত্য পরিবেশন করার প্রচলন প্রত্যক্ষ করা গেছে। এসবের ওপর ভিত্তি করে চর্যার তৎকালীন সুর কেমন ছিল – সে সম্পর্কে কিছু সাধারণ ধারণা ও অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন –

১. প্রতিটি পদের ওপর রাগ-রাগিণীর নাম উৎকলিত আছে, এর থেকে অন্তত দুইটি দিক অর্থাৎ এর ভাব-রস ও স্বরগ্রাম সুস্পষ্টভাবে অনুমান করা যায়। সুরের চলন সম্পর্কেও আংশিক ধারণা পাওয়া সম্ভব।

২. চর্যাপদ সম্পর্কে বলা হয়েছে– এর মধ্যে যে দর্শন রয়েছে তাতে মহাযানী বৌদ্ধধর্মের অন্তর্বর্তী মতগুলির দুইটি দিক প্রতিষ্ঠিত আছে।[৪] মহাযানী প্রাচীন স্তোত্র পাঠের নিদর্শন বর্তমানে বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। চীন, শ্রীলংকা, তিব্বত, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে এখনো বিদ্যমান রয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধস্তোত্র পাঠের নানান সুর-নিদর্শন।

৩. নেপাল ও ভারতের কিছু অঞ্চলে এখনো চর্যাগীত পরিবেশনের প্রচলন রয়েছে। সেখানে যে সুর পাওয়া যায়, তাতে প্রাচীনত্ব অক্ষত রয়েছে – একথা বলা অবান্তর, তবে বিবর্তনের মধ্য দিয়েও যেটুকু সুরবৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তা প্রথাসিদ্ধ এবং বিশেষ করে তান্ত্রিক ও বৌদ্ধস্তোত্র পাঠের সুর থেকে কিছুটা হলেও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। এ থেকেও সুরের বয়নশৈলী কেমন ছিল তা অনুসন্ধান করার সুযোগ রয়েছে।

৪. চর্যাগীত দেশি হলেও তা প্রকীর্ণ শ্রেণির গান। অর্থাৎ এই ভাবধারায় যে শুধু বঙ্গ অঞ্চলের সিদ্ধাচার্যগণ গান রচনা করেছেন তা নয়, বরং অন্যান্য অঞ্চলের সাধকগণও চর্যাজাতীয় সংগীত ও দোহা রচনা করেছেন। অতএব আঞ্চলিক সুরবয়নকে অনুসরণ করে এবং অন্যান্য অঞ্চলের চর্যা, তান্ত্রিক সুরও পর্যবেক্ষণ করে তৎকালীন সুররেখার ধারণা পাওয়া সম্ভব।

৫. চর্যাগীতির পরেই দেখা যায় গীতগোবিন্দ, নাথগীতিকা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে একই ধরনের রাগ-রাগিণীর নামের উল্লেখে ধারণা করা যায় এই সংগীতগুলোর প্রচলন বাংলার জনপদে বিদ্যমান। এতদঞ্চলের সুরবৈশিষ্ট্যের সাথে মিথিলা, উড়িষ্যা ও আসাম অঞ্চলের প্রাচীন লোকগীতের সুরানুসন্ধানের মাধ্যমেও চর্যাসুরের নৈকট্যে পৌঁছানো সম্ভব।

৬. চর্যার ভাষা ও দর্শন নিয়ে যে ধরনের বিতর্ক হয়েছে, সুর নিয়েও সমপর্যায়ে বিতর্ক উঠলে তা মিউজিকোলজির অধ্যায় হিসেবে গুরুত্ব লাভ করত। তখন 'এথনোমিউজিকোলজি' বা নৃসংগীতবিদ্যাভিত্তিক গবেষণার আলোকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে অতীতের সুরের অনেকটা কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব হতো।

৭. চর্যাগীতিতে বেশকিছু বাদ্যের উল্লেখ আছে, যেমন, 'ডমরু, ঘণ্টা, নেউর' (চর্যা ১১), হেরুঅ বীণা (চর্যা ১৭), 'পটহ, মাদল, কশালা, করণ্ড, দুন্দুভি' (চর্যা ১৯) ইত্যাদি। এই বাদ্যসমূহ এখনো সানতাল, মুণ্ডা, শবর জনপদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত—তাদের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় ও বাদ্য অনুসন্ধান করেও অনুকূল সুর খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

চর্যাগীতির উপরে নির্দেশনা আকারে যে রাগ-রাগিণীর নাম দেয়া হয়েছে, তা থেকে সুস্পষ্টভাবেই ভাব এবং রসের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব। কিন্তু যেহেতু কারো কারো মতে চর্যা মার্গসংগীত নয়, ফলে সুনির্দিষ্ট সুরে গাইবার বাধ্যবাধকতা থাকবার সম্ভাবনা না থাকাই স্বাভাবিক। তবে আঞ্চলিক চলনের একটি প্রবহমানতা যে ছিল তা লোকসংগীত বা তান্ত্রিক উপাস্য কিংবা সাধনসংগীতের চলন লক্ষ্য করে বিশ্লেষণ করা সম্ভব, যেমন অধিকাংশ ভাটিয়ালি গান ঝিঁঝিট রাগ, ভাওয়াইয়া গানে কাফী রাগের প্রভাব সুস্পষ্ট। আবার কীর্তন গানের একটা নির্দিষ্ট চলন রয়েছে, যদিও তা প্রহরের অভিযোজনে একই পদ বিভিন্ন রাগে পরিবর্তন করে গাইতে পারেন কীর্তনীয়াগণ। ফলে বৈদিক ও মার্গ অভিজাত সংগীতের ন্যায় সুনির্দিষ্ট রাগের কাঠামোয় চর্যাগান গাওয়া হতো, তা বলা অত্যুক্তি হবে।

চর্যাগীতিতে মোট আঠারোটি রাগ ও একটি তালের নাম পাওয়া যায়। কিছু কিছু রাগের পরিচয়, স্থান, সুরের চলন ও ভাব-রূপ সম্পর্কে তথ্য বর্তমানে প্রচলিত। কিছু রাগ বিলুপ্ত। নিম্নরূপ রাগের তালিকা ও চর্যাসংখ্যা নির্দেশিকা প্রদান করা হলো :

ক্রম	রাগের নাম	চর্যা সংখ্যা	সূত্র
০১	পটমঞ্জরী	চর্যা-১, ৬, ৭, ৯, ১১, ১৭, ২০, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬ ও ৪৮	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ
০২	গবড়া (গউড়া) মালসী গবুড়া*	চর্যা-২, ৩, ১৮ ও ৪০*	চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ
০৩	অরু	চর্যা-৪	চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ
০৪	গুর্জরী (গুঞ্জরী),	চর্যা-৫, ২২, ৪১ ও ৪৭	চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ
০৫	দেবক্রী	চর্যা-৮	চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ
০৬	দেশাখ	চর্যা-১০ ও ৩২	চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ
০৭	ভৈরবী	চর্যা-১২ (১৯) ও (৩৮)	১৯ ও ৩৮ তম পদের রাগ শ্রী তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের পাঠসংস্কার থেকে পাওয়া

০৮	কামোদ	চর্যা-১৩, ২৭, ৩৭ ও ৪২	চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ
০৯	ধনসী	চর্যা-১৪	চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ
১০	রামক্রী	চর্যা-১৫ ও ৫০	চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ
১১	ভৈরব	চর্যা-১৬, ১৯ ও ৩৮	চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ
১২	বরাড়ী (বলাড্ডী)	চর্যা-২১, ২৩, ২৮ ও ৩৪	চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ
১৪	শবরী (শীবরী)*	চর্যা-২৬* ও ৪৬	চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ
১৫	মল্লারী	চর্যা-৩০, ৩৫, ৪৪, ৪৫ ও ৪৯	চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ
১৬	মালসী	চর্যা-৩৯	চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ
১৭	বঙ্গাল	চর্যা-৪৩	চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ
১৮	ইন্দ্রতাল	চর্যা-২৪	চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ

১৬, ১৯, এবং ৩৮তম চর্যায় 'ভৈরব' এবং ৪৩তম চর্যায় 'বঙ্গাল' রাগের কথা বলা হয়েছে। বঙ্গাল বা বঙ্গালী বা বাঙালি রাগিণী যে বাংলাদেশ ভূ-অঞ্চল থেকেই উদ্ভূত, তার প্রমাণ নামের মধ্যেই অংকিত। ৫ম শতকের দিকে মতঙ্গ তাঁর 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থে বলেছেন 'বঙ্গালদেশসম্ভুতা বঙগালী দিব্যরূপিণী'। পণ্ডিত দামোদর বঙ্গাল বা বাঙালী রাগের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন–সা-গ-ম-প-নি-র্স, কিংবা ম-প-ধ-নি-র্সা-র্রি-র্গা। এর সাথে বর্তমানের স্বর ও চলনের মিল পাওয়া যায় না। এই রাগিণী সম্পর্কে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেন 'বাঙালীরাগিণী ভৈরব রাগের নায়িকা, শিবপূজারতা, ব্রহ্মচারিণী, ভস্মাঙ্গা, বদ্ধজটাজালশোভিতা। দিবা প্রহরে বাঙালীরাগিণী গান করা হয়' (প্রজ্ঞানানন্দ, ১৯৮৬ : ১৬০)। ভৈরবরাগও অনার্য অরণ্যচারী পর্বত উপত্যকাবাসীদের অথবা ভৈরব জাতির গানের সুর থেকে গৃহীত বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। একারণে উভয়ের মধ্যে স্বরের মিল লক্ষ্যণীয়। ফলে এক পর্যায়ে বঙ্গালীরাগিণী বঙ্গালভৈরব নামেও প্রতিষ্ঠা পেতে দেখা গেছে। লোচনশর্মা তার 'রাগতরঙ্গিনী' গ্রন্থে বলেছেন 'বংগালী মধুমাধবী অওর বরাড়ী ভানি/ মুখর ভৈরবী সৈন্ধবী ভৈরও কে তিঅ জানি॥' অর্থাৎ বঙ্গালী, মধুমাধবী, বরাড়ী, ভৈরবী ও সিন্ধু এই পাঁচটি রাগ ভৈরব রাগের বরণীয়া স্ত্রী রূপে গণ্য (রাজ্যেশ্বর, ১৩৯১ : ১৩)। পাস্ কালস চার্লস গমেজের 'রাগরঙ্গ বিলাসিনী' গ্রন্থে বলা হয়েছে 'বাঙ্গালী ভৈরব মেলের অন্তর্গত। এটা ষাড়ব জাতীয় রাগ। এর বাদী ধৈবত ও সমবাদী রেখাব। গাওয়ার সময় প্রাতঃকাল' (পাস্ কালস, ১৯৮২ : ৫)। তিনি এখানে আরোহী দেখিয়েছেন

স ঋ গ ম প দ র্স, এবং অবরোহী দেখিয়েছেন র্স দ প ম গ ঋ স। তবে এর চলনে স-দ-প-ম-গ, চলনে গ-ম-ঋ-স, বা দ-প-গ-ম-দ-প-গ-ম-ঋ-স ইত্যাদি। এখানে বঙ্গাল রাগ যে ছয় স্বরে আবদ্ধ ছিল এবং কিছুটা চঞ্চল ও উল্লম্ফনধর্মিতা ছিল তা 'সা' থেকে 'দা'-তে সরাসরি উত্থানের মধ্যদিয়েই বোঝা যায়। কারণ ভৈরব রাগের মধ্যে এই উল্লম্ফনধর্মিতা লক্ষ করা যায় না। ভুসুকুপাদানাম রচিত বঙ্গাল রাগের এই গীতটি জন্ম-মৃত্যু, সাধনা এবং মহাসুখের ব্যাখ্যা সম্বলিত সৃষ্টিতত্ত্বের এক চমৎকার প্রসঙ্গ। যেমন :

সহজ মহাতরু ফরিঅএ তেলোএ।
খসমসহাবে রে বান্ধণত মুকা কোএ॥ ধ্রু॥ (চর্যা ৪৩)

এই পদাবলিতে প্রতি দুই পদ অন্তর ধ্রুব ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব আট পদের গীতটি চারবার হয়তো একই ধরনের সুরে গীত হতো। তারই একটি কল্পিত সুর যা প্রচলিত বঙ্গালরাগে চলনের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে স্বরলিপি-১ এ।

স দ দ প	ম গ ম ঋ	স গ ঋ স
স হ জ----	ম-------হা----	ত------রু ---
ঋ ঋ ঋ সা	স স গ ম	প দ র্স দ
ফ------রি-----	অ------এ-----	তো--- বো এ
প গ ম ঋ	স ঋ প প	ম গ ঋ স
খ স ম স	হা------বে----	রে------বান----
স দ দ প	ম গ ম ঋ	স গ ঋ স-
ধ ন ত ----	মু------ কা----	কো-----এ-----

স্বরলিপি -১

গুর্জরী এবং কহ্নুগুঞ্জরী এবং গুঞ্জরী রাগের মোট চারটি গীত পাওয়া যায় তা হলো ৫, ২২, ৪১ এবং ৪৭তম পদ। ৫ম পদকর্তা হলেন চাটিল্লাপাদানাম, ২২তম পদকর্তা হলেন সরহপাদানাম, ৪১তম পদকর্তা হলেন ভুসুকুপাদানাম এবং ৪৭তম পদকর্তা হলেন ধম্মপাদানাম। গুর্জর বা গুর্জরী রাগিণীর জন্ম গুর্জর দেশ থেকেই বা গুর্জর জাতি থেকে এসেছে। এরা শক, যবন, বাহ্লিক, হূনদের মতোই অনার্য জাতি। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙলার ইতিহাস' গ্রন্থে এই জাতির পরিচয় প্রদান করেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী খ্রিস্টীয় ৭ম শতকে কবি বাণের হর্ষচরিতে গুর্জর জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়[৫] প্রজ্ঞানানন্দ বলেন,

> প্রথমে ভারতে প্রবেশ করে গুর্জররা ভারতীয়-নৃপতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহ করতো। ক্রমে তারা ভারতীয়-সমাজে বাস করতে করতে ধীরে ধীরে ভারতীয়-সমাজের মধ্যে মিশ্রিত হয় ও স্থায়ীভাবে ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করে। (...) ইউয়ান্-চোয়াঙ ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত পরিভ্রমণ করে বলেছেন যে, সহস্রক্রোশব্যাপী গুর্জর রাজ্যের মানুষ ক্রমে ভারতে স্থায়ী বসবাস স্থাপন করেছিল। খ্রীষ্টীয় শতকের প্রারম্ভে বর্তমান ভরোযের তথা ভৃগুগুচ্ছ বা ভরুকচ্ছ নগরের কাছে অতিক্ষুদ্র একটি গুর্জর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ স্থানের নাম ছিল লাট বা দক্ষিণ গুজরাট। (...) গুর্জর জাতির উপনিবেশ দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। (১) কান্যকুব্জকে কেন্দ্র করে উত্তর-ভারতে, এবং (২) ভরোয বা ভৃগুকচ্ছকে কেন্দ্র করে পশ্চিমে লাট দেশ-পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। লাট দেশকে এজন্য দক্ষিণ 'গুর্জরচক্র' বলা হোত। তেমনি ছিল 'উত্তর-গুর্জরচক্র'–যেখানে ৭৮৩ অব্দে বৎস্যরাজ রাজত্ব করতেন। বৎস্যরাজ পূর্বদেশে প্রবেশ করে গৌড়দেশ জয় করেন, ফলে গৌড়সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে একটি সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল গুর্জরজাতির। ক্রমে গুর্জরজাতি ও সুসভ্য আর্য জাতির মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবহারের মধ্যেও তাদের একটি সখ্যসূত্র গঠিত হয়েছিল। এভাবেই গুর্জর জাতির জাতীয় গানের সুর দশলক্ষণে সংশোধিত হ'য়ে ভারতীয় মার্গ সংগীতের অঙ্গীভূত হয়েছিল। (প্রজ্ঞানানন্দ, ১৯৮৬ : ১৫২)

গুর্জরী সংগীতের চলন বৌদ্ধসাধকদের মাঝেও প্রচলিত হয়। গুর্জরী রাগের প্রাচীন রূপ কেমন ছিল সে সম্পর্কে জানা যায়নি। তবে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাগটি এখনো ভারতীয় সংগীতে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। গুর্জরী রাগের সাথে টৌড়ী মেলের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তবে তা ঋষভ বর্জিত ষাড়ব বা ছয় স্বরের রাগিণী। এর বাদী স্বর কোমল ধৈবত এবং সমবাদী কোমল রেখাব। 'গীতগোবিন্দে' গুর্জরী রাগ যতি তালে গাইবার প্রচলন ছিল বলে জানা যায় (রাজ্যেশ্বর, ১৩৯১ : ১৪৫)। অনেক ধরনের গুর্জরী রাগিণীর প্রচলন ছিল, যেমন দক্ষিণা গুর্জরী, সেয়ংমতাগুর্জরী, সৌরাষ্ট্র গুর্জরী, দ্রাবিড় গুর্জরী ইত্যাদি। সেই হিসেবে কহ্নুগুর্জরী হয়তো কাহ্নুপাদানাম (কাহ্নু হলেন বঙ্গসন্তান)[৬] প্রবর্তিত বিশেষ একটি চলন– যা ভুসুকুপাদানাম তার ৪১তম পদে ব্যবহার করেছেন। এই গানগুলোর সুর কেমন ছিল তা রাগ গুর্জরীর চলন অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা সম্ভব। রাগ গুর্জরীর চলন হলো:

'ন-ঋ-জ্ঞ-ক্ষ, জ্ঞ-ঋ-স-ন,
দ্-ন-স-ঋ, জ্ঞ-ম-দ-ক্ষ,
জ্ঞ-র-জ্ঞ-ক্ষ, জ্ঞ-ঋ-ন্-স,
স-ঋ-জ্ঞ-ক্ষ, দ-ন-দ-ক্ষ,
জ্ঞ-ক্ষ-দ-ক্ষ, জ্ঞ-ঋ-ঋ-জ্ঞ' ইত্যাদি।

পটমঞ্জরী রাগটি প্রাচীনকালে অত্যধিক জনপ্রিয় ছিল, চর্যাগীতির ১২টি গীত এই রাগে প্রতিষ্ঠিত। পটমঞ্জরী কাফী মেলের মধ্যে পড়ে অর্থাৎ এই রাগের দুইটি স্বর যা গান্ধার এবং নিষাদ কোমল। আধুনিক সময়ে রাগটির জাতি সম্পূর্ণ হিসেবে ধরা হলেও যেহেতু আরোহণে ধৈবত ও গান্ধার দুর্বল থাকে, প্রাচীনকালে ঔড়ব বা ষাড়ব জাতির ছিল কি না, তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই রাগটি এত ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় সংগীতের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহে পটমঞ্জরী নামে রাগের উল্লেখ ও ব্যবহার বেশ গৌণ। অথবা বলা যেতে পারে ভিন্ননামে তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। নারদের সংগীত-মকরন্দে 'পড়বজ্জী' ও 'ফড়মঞ্জরী' রয়েছে। মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে কোনো উল্লেখ নেই। এমনকি শার্ঙ্গদেবের 'সংগীত রত্নাকরের'ও কোথাও উল্লেখ নেই, যদিও চর্যা শব্দটির নাম পাওয়া যায়। তবে দামোদর তাঁর 'সংগীতদর্পণে' পটমঞ্জরীর কথা বলেছেন এবং তা সম্পূর্ণজাতীয় রাগ বলে পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেন 'পটমঞ্জরী অতিশয় রূপসী, সুবর্ণ অপেক্ষাও তার বর্ণ উজ্জ্বল, পরমসৌন্দর্যময়ী ও লাবণ্যযুক্ত' (প্রজ্ঞানানন্দ, ১৯৯৬ : ৩০৯)। বর্তমানকালে এর বাদীস্বর ষড়জ এবং সমবাদী পঞ্চমস্বর ধরে গীত হয়। পটমঞ্জরীর রূপ সম্পর্কে প্রজ্ঞানানন্দ দেখিয়েছেন 'ণ্-স-রস, ণ্-ধ্-প্-স, রম-প, ধ-জ্ঞ, র-জ্ঞ, ম-জ্ঞ-র-স'। পটমঞ্জরী রাগে চর্যাগীতি রচনা করেছেন ১, ৬, ৭, ৯, ১১, ১৭, ২০, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৪৮তম গানের মধ্যে যথাক্রমে লুইপা, ভুসুকুপা, কাহ্নপা, বীণাপা, কুক্কুরীপা, আর্যদেবপা এবং ঢেন্ডণপা। তন্মধ্যে কাহ্নপা রচনা করেছেন চারটি গীত একই রাগে এবং লুইপার মোট দুটির প্রত্যেকটিই এই রাগে। অতএব ধারণা করা যায় রাগটি বাংলার এই অঞ্চলে গ্রামীণ ও লোকপর্যায়ে বিকশিত ছিল। তবে প্রথম চর্যাটি পটমঞ্জরী হওয়ায় এবং বিষয়গত কারণে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। লুইপার রচিত গীতটি হলো :

> কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল।
> চঞ্চল চীএ পইঠা কাল॥ ধ্রু॥ (চর্যা-১)

এই গানটির বেশ কয়েকটি সুর প্রচলিত আছে। তবে এখানে সন্নিবেশ করা হলো নেপাল থেকে প্রাপ্ত চর্যানৃত্যকার রাজেন্দ্র শ্রেষ্ঠর মুখ থেকে শোনা সুর। যিনি তাঁর গুরুর নিকট থেকে শুনেছিলেন বলে অভিমত রেখেছেন। *(স্বরলিপি-২)*। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে প্রচলিত আরো একটি সুর রাগ পটমঞ্জরিতে গেয় : (করুণাময়, ১৯৯৩ : ৩৪৭) *(স্বরলিপি-৩)*

শার্ঙ্গদেব চর্যার ছন্দ সম্পর্কে বলেছেন 'পাদান্তপ্রাস শোভিতা'। 'অর্থাৎ যাহা পদ্ধড়ী প্রভৃতি ছন্দে নিবদ্ধ, পদান্তে অনুপ্রাসযুক্ত, আধ্যাত্মিক বিষয়ের বর্ণনা সংবলিত ও দ্বিতীয় তালে গেয় তাহার নাম চর্যা। (হরপ্রসাদ, ১৩২৩ : ৪)। ২০০৯ সালে নেপাল থেকে শ্রী রাজেন্দ্র শ্রেষ্ঠ-এর নিকট থেকে পাই চতুর্থতম চর্যাগীতির একটি সুর। যা তিনি প্রচলিত সুর অর্থে ব্যবহার করে আসছেন। এই সুরের চলন শুনে আধুনিক মনে

হয় না। কিছুটা প্রাচীন মেয়েলি গীত বা সাধারণ লোকগীতের মতো শোনায়। তিনি বলেন এই চর্যাটি রাগ ত্রাবলী এবং তাল ত্রিহুরায় প্রতিষ্ঠিত। আবার তিনি বলছেন কখনো কখনো কামোদ রাগ রূপের আশ্রয়েও এই গীতটি পরিবেশন করে থাকেন।

পধ	ধর্স	র্সন	নধ	০	ধ	নধ	প
কা	আ	ত	রু	০	ব	র	০
ম	পণ	ধ	পধপ	মপম	গমগ	র	স
পন	চ	বি	ডা	০	ল	০	০
প	ধ	র্স	নর্স	নধ	ধন	ধপ	ম
চন	চ	ল	চি	০	এ	০	০
ম	পণ	ধ	প	০	প	০	০
পই	ঠা	০	কা	০	ল	০	০
প	ধ	র্স	র্স	০	র্স	র্স	০
দৃঢ়	ক	রি	ও	০	ম	হা	০
র্সর্র	র্র	র্গর্র	র্স	র্সন	ধন	ধ	০
সুহ	প	রি	মা	০	ন	০	০
র্র	র্র	র্গর্স	র্স	র্সন	ধ	ধ	ধম
লু	ই	ভ	ন	ই	গু	রু	০
ম	পণ	ধ	প	০	প	০	০
পুছ	ছি	অ	জা	০	ণ	০	০

স্বরলিপি -২

র	-জ্ঞ	র	জ্ঞ	ম	জ্ঞ	র	স	-র	স	ণ্	ধ্	প্	স
কা	০	আ	ত	রু	ব	র	প	ন্	চ	বি	০	ডা	ল
ণ্	-স	র	ণ্	-স	র	গ	ধ	-প	ধ	ম	-গ	মজ্ঞ	-র
চ	ন্	চ	ল	০	চি	এ	পই	০	ঠা	কা	০	ল	০

স্বরলিপি -৩

রাজেন্দ্রের কাছে পাওয়া হেবজ্রযোগিনী, দোহা ও অন্যান্য চর্যাগীতের মধ্যে থেকে এই একটি পদেরই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্যার সাথে আংশিক মিল পাওয়া যায়। গুণ্ডরীপাদানাম রচিত পদে রয়েছে :

তিয়ড়া চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী

কমলকুলিশ ঘাণ্টে করহু বিআলী॥

রাজেন্দ্র শ্রেষ্ঠ কর্তৃক মৌখিকভাবে প্রাপ্ত পদ:

(আহা) ত্রিহণ্ডা চাপই ইয়োগিনী (যোগিনী) দেহাবাদী

(আহা) কমলকুলিশ ঘণ্টা করহু বিহারী॥ (স্বরলিপি চিত্র-৪)

একমাত্র প্রামাণ্য সুর হিসেবে তিনি বলেন, এই সুর তিনি তাঁর বজ্রাচার্য শিক্ষাগুরুর নিকট থেকে শিখেছেন। সুরচিত্রটি নিম্নরূপ :

								প	পম
								আ	হা
মর	রস	স	প্	স	সন্	স	ম	ম	প
ত্রি	০	হ	ণ্ডা	চা	০	প	০	০	ই
র্সপ	পম	পম	মপধ	প	প	ম	০	প	মপধ
ইয়ো	০	গি	নি	দেহ	বা	দী	০	আ	হা
পম	ম	মগ	সর	ম	পর্স	র্সপ	প	ধপম	ম
ক	ম	লা	কু	লি	শা	ঘ	০	অন্	টা
ণ	ধপ	পম	ধপম	র	রস	স	০	প	পর্স
ক	রা	হু	বি	হা	০	রে	০	আ	হা

স্বরলিপি -৪

তৎকালীন রাগ-রাগিণী কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উদঘাটন বা অনুসন্ধান করতে গেলে সেই সময়ের বাঙালি জাতি ও চর্যাসমাজ সম্পর্কে বৈষয়িক পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। চর্যাগীতি বাংলাভাষার আদিনিদর্শন হিসেবে নানা মনীষী ও গবেষক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে সার-সিদ্ধান্ত এসেছে যে চর্যার ভাষা বাংলাসহ আরো বেশ কয়েকটি ভাষার আদিরূপ। বাঙালি জাতিও যে অনেক প্রাচীন তার প্রমাণ মিলেছে বেদ ও বেদোত্তর প্রাচীন গ্রন্থে[৭]। এবং তাদের অধিকাংশই অনার্য ছিল, সে সম্পর্কেও প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে অনার্যের সুরবৈশিষ্ট্যে আর্চিক থেকে ঔড়ব পর্যন্ত ৫ স্বরের প্রয়োগই প্রধান ছিল তার সাথে বর্তমান প্রচলিত অনেকগুলো চর্যাব্যবহৃত রাগ-রাগিণীর সুর ও চলনের অমিল লক্ষ্যণীয়। কালের বিবর্তনে সুরবৈশিষ্ট্য ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বলেন :

> আমাদের আর্যসঙ্গীত অনার্যজাতির নানা 'দেশওয়ালী' বা 'দেশী' সঙ্গীত হইতে প্রচুর পরিমানে উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাহার বৃহৎ কলেবর সুপুষ্ট করিয়াছে। যে-কোন সৃষ্টির ইতিহাসে দেখা যায় প্রত্যেক কৃষ্টির রূপ নানা বিজাতীয় সভ্যতার উপকরণ আত্মসাৎ করিয়া পরিবর্দ্ধিত, সম্পূর্ণ কৃষ্টি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অত্যন্ত বিরল। সুতরাং আর্যসঙ্গীত যদি অনার্যসঙ্গীত হইতে নতুন রস বা উপাদান আত্মসাৎ ও পরিপাক করিয়া তাহাকে আর্য সঙ্গীতের বিশিষ্ট রূপে রূপান্তরিত বা পরিণত করিয়া থাকে তাহাতে আর্য সঙ্গীতের শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। (প্রজ্ঞানানন্দ, ১৩৫৯ : ১০)

এ থেকে বোঝা যায় আর্যসংগীত সাতস্বরের বৈশিষ্ট্যে অক্ষুণ্ন থেকেও এবং অন্যান্য অনার্য, দেশি ও আঞ্চলিক সংগীত কাঠামোকে বা তার ভাবকে সমুন্নত রেখেও নিজস্ব চলনে প্রলেপায়িত করেছে। এরপর প্রাক-ইসলামি ও মুঘল আমলে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় পট পরিবর্তনের কারণে সংগীতের বিস্তর পরিবর্তন ঘটে, তখন বহির্বিশ্বের সুর ভারতীয় সংগীতে অনুপ্রবেশের পাশাপাশি ভারতীয় আর্যসংগীতের পরিপুষ্ট কাঠামো সর্বত্র বিকশিত হয়েছে। একারণেই পুরোনো রাগ-রাগিণীর বৈশিষ্ট্যের সাথে বর্তমানের প্রচলিত সুরের চলন ও জাতি-স্বরের ভিন্নতা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। যেমন কম্বোজ শব্দটি থেকে খাম্বাজ রাগের উৎপত্তি। কম্বোজ এসেছে কম্বোডিয়া থেকে। অবশ্য এক্ষেত্রে নানা ধরনের মত-পার্থক্যও রয়েছে।[৮] ভারতের পূর্বে এই ভূখণ্ডের মানুষও অনার্য এবং দেশী গানের ধারক। সেই সুত্রে এই রাগের প্রচলন ৪ স্বরের অধিক হবার কথা নয়। অথচ বর্তমানে ৭ স্বরের ঠাটে রূপান্তরিত হয়েছে। চর্যাগীতির মধ্যে যেসকল রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে তন্মধ্যে গুর্জরী, বঙ্গালী, শবরী, কহ্নুগুঞ্জরী এগুলিও আঞ্চলিক, এধরনের অনেক রাগই আর্য ও মুঘল সময়ের মিশ্রণে বিস্তৃত হয়েছে। তাছাড়া বর্তমানকালের রাগ-রাগিণীর যে বিস্তার, তার সঙ্গে প্রাচীন রাগ পরিবেশনার বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। সেখানে ধ্রুপদের সুর অক্ষত রাখার প্রবণতা থাকলেও লোকসংগীতের সুর সময় ও কণ্ঠভেদে পরিবর্তিত হয়েছে।

চর্যাগীতি ধ্রুপদের বৈশিষ্ট্য সংবলিত রাগসংগীত নয় আবার লোকসংগীতও নয় তবে রাগ-পদ্ধতির মূল উপাদানের সাথে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। বৃহদ্দেশীর মতানুসারে বঙ্গে মার্গ সংগীতের প্রচলন ছিল না। যা ছিল দেশি এবং লোকসংগীত থেকেই আসা। চর্যাগীতি যে ধ্রুপদ আঙ্গিকের ন্যায় অকাট্য সুর-রক্ষণশীল ছিল না, তার প্রমাণও মিলছে শার্ঙ্গদেবের 'সংগীত রত্নাকরে'। বর্তমানে গানের যে আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারি ও আভোগ থাকে, সেকালে তা ছিল উদগ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ। এই অংশগুলোকে ধাতু বলা হতো। চর্যাগীতিতে চারধাতু পাওয়া যায় না, তবে উদগ্রাহ ও ধ্রুব সর্বত্রই থাকতো। কিছু চর্যায় শুধু মেলাপক বর্জিত ছিল। ফলে তাকে ত্রিধাতুক প্রবন্ধগীত বলা হতো (হাই ও পাশা, ১৪১৪ : ৩৩)।

চর্যাগীতি লোকায়ত জীবন প্রভাবিত হলেও তা ভৌগোলিক সীমারেখার সাংগীতিকতা দ্বারা আক্রান্ত ছিল না; উত্তরাধিকার হিসেবে বাউল গানে একই ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কারণ সিদ্ধাচার্যগণ গ্রামীণ সংস্কৃতিকে বহন করার পাশাপাশি সেকালের নাগরিক ঐশ্বর্যের সম্পদ, রুচি ও বিলাসিতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ১০সংখ্যক চর্যায় বলা হয়েছে, 'নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ', কিন্তু নগরের অভিজাত সুরকে সরাসরি অবলম্বন না করেও সমৃদ্ধ সাংগীতিকতা সুরবৈশিষ্ট্যে ধারণ করেছিল। যেমন ঢাকের নাচের সাথে লোকজীবনের কিছু মানুষ অশ্লীল গান গাইত। তারা পাশা-দাবা (নহবল) খেলত। এসবের বিষয়েও যে গীতিকারগণ সচেতন ছিলেন এবং অশ্লীলতাকে রূপক ও গভীর ব্যাখ্যায় উপনিত করেছেন তার বর্ণনাও চর্যায় উপজীব্য। অমিয়নাথ সান্যাল তাঁর 'বাংলার সংগীত প্রাচীনযুগ ও মধ্যযুগ' গ্রন্থে চর্যাসুরের মান সম্পর্কে বলেন :

> চর্যাপদের আবির্ভাবের সমকালীন বঙ্গীয় লোকসমাজ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকসমাজ থেকে সংগীত বিষয়ে অগ্রসর ও আগ্রহান্বিত ছিল। কারণ অন্যান্য প্রদেশের লোক গাথার শিরোনামায় রাগ-রাগিণীর নাম পাওয়া যায় না। চর্যাগীতি শুধুমাত্র বাংলায় নয় ভারত তথা পারস্য দেশেও সংগীত-এর প্রাচীন ইতিহাসে-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। (মীনাক্ষী, ২০১৩ : ৪২)

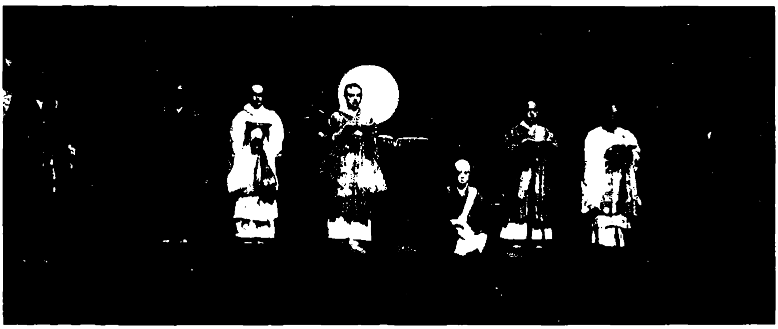

সৌম্য সংগীত পরিবেশনরত জাপানের বৌদ্ধগণ। পরিবেশন ফেব্রুয়ারি ১০, ২০০৬, টোকিও

বর্তমানকালে নেপাল ও তিব্বতের চর্যানুশীলনকারী বজ্রাচার্যদের উত্তরাধিকার সূত্রে চর্যানৃত্যগীত পরিবেশনায় যে সুরের রূপ পাওয়া যায় তা থেকে চর্যার আদিসুর কেমন ছিল সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ মেলেনি। তবে ভারতবর্ষীয় সংগীতই প্রাচীনকালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ কিছুটা চীন-জাপানের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও চিত্রকলার মধ্যে পাওয়া যায়। ফরাসি অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি তাঁর Lumbini Orchestra প্রবন্ধে জাপানের হরিইউজি মন্দিরের সুর সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছিলেন। ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচীকে লেখা একটি পত্রে সিলভাঁর সেই প্রসঙ্গই উঠে এসেছে :

> Sanskrit stanza which I have restored from a faulty Chinese transaction, and also the music or the song, as preserved in the temple of Horiyuji. I had a very successful visit to that temple. (...) I have taken a notation of the airs and reconstracted the songs. India is going to get back one of its ancient melodies of not later than 8th century A.D. (প্রজ্ঞানানন্দ-১৩৫৯, পৃ. ১২)

২০০৫-০৬ সালে জাপানের নারা প্রদেশে অবস্থিত হরিইউজি মন্দিরে সরেজমিনে ভোরের প্রার্থনা পরিদর্শনের সুযোগ ঘটেছিল অধ্যাপক কিয়োকো মোতেগি ও সাইতো সেতসুজিও-এর প্রণোদনায়। এছাড়া নারার তোদাইজি মন্দির ও হাসেদেরা মন্দির ভ্রমণে বৌদ্ধগণের স্ত্রোত্রপাঠ শোনার সৌভাগ্য ঘটেছিল। টোকিওর ক্যারিইওবিঙ্গা বুদ্ধিস্ট রিসার্চ সোসাইটির গবেষক হিসেবে বুদ্ধিস্ট সিঙ্গন সম্প্রদায়ের 'সৌম্য' স্তোত্রপাঠ প্রশিক্ষণে দশমাসব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে সেখানেও একই ধরনের সুর লক্ষ করা যায়। এই দশমাসের প্রশিক্ষণে প্রাচীন বৌদ্ধ স্বরলিপি পাঠ, সুর শিক্ষণের কালে শিক্ষক মি. কাসু কেন একই কথা বলেন যে এই সুরসমূহ ভারতীয় সংগীতেরই প্রাচীন রূপ। যা চীন থেকে অক্ষত রূপে প্রাপ্ত হয়েছে জাপানে। এ বিষয়ে বুজান শাখার সিংঘি সিংগন সেক্টরের ইউথ এ্যসোসিয়েশনের বক্তব্য হলো :

> Mahayana Buddhism was transmitted to China in the first century C.E. Buddhist hymns, known there as *fanbei*, were basically of two types: Sanskrit hymns sung in approximate transliterations of the original language, and Chinese hymns, some of which were translations of the Sanskrit hymns and some of which were newly composed. From about the third century, the mountain Yushan (Jp. Gyosan) in Shandong Province became established as the center of Chinese Buddhist chant. (Youth-1998, P. 460)

জাপানের নারা প্রদেশে প্রাচীন তোদাইজি মন্দিরের অভ্যন্তরে বৌদ্ধগণের সৌম্যসংগীত পরিবেশন

জাপানের নারা প্রদেশে প্রাচীন তোদাইজি মন্দিরের একাংশ

উপর্যুক্ত তথ্যসূত্রের উপর ভিত্তি করে এটুকু প্রমাণিত হয় যে সংস্কৃত স্তোত্র চীন হয়ে জাপানে প্রবেশ করে, যার অজস্র স্বরলিপি রক্ষিত আছে, এগুলো ১৯৯৮ সালে ও ২০০৫ সালে বৃহৎ কলেবরে প্রকাশিত হয়। ২০০৬ সালে সিঙ্গন সম্পদায়ের পক্ষ থেকে ১০টি সিডি সম্বলিত একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং টোকিওর রয়্যাল রিগা হোটেলে ৪ ফেব্রুয়ারি তার প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানে একমাত্র শিল্পী হিসেবে 'কনসার্ট অব বাংলাদেশ'[৯] শিরোনামে এই গবেষকের বাংলার লোকসংগীত ও বাউলগান পরিবেশনের সুযোগ ঘটেছিল। সিঙ্গন সেক্টরের 'সৌম্য' বা 'সোমিও' সংগীতের উপর গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হয়। ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত প্রথম পর্বের গ্রন্থে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে সপ্তম শতকে মন্ত্রযানী সংগীত ও নৃত্যধারার বিকাশ ঘটেছিল, যা দক্ষিণ এশিয়ার শাস্ত্র ও নামমুদ্রাঙ্কিত। এই ধারাটি নবম শতকে চীন থেকে জাপানে প্রবেশ করে। এই সময় জাপানি বৌদ্ধ সমাজ দুই ধরনের শাস্ত্র আমদানী করেন। প্রথমত তেন্দাই সম্প্রদায় শিক্ষাদান করেন 'সদ্ধর্ম্ম-পুণ্ডরিকা' সূত্র (জাপানিজ হোকে-কিও), আরেকটি হলো সিঙ্গন সম্প্রদায়ের পক্ষে সাইচো (৭৬৭-৮২২) শিক্ষাদান করেন 'অমোঘবজ্র' সংগীত বিষয়ে। এ সময় দুই ধরনের কণ্ঠ ও স্তোত্র সুর অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তা হলো 'বঙ্গ-নো-সান' বা সংস্কৃত স্তোত্রপাঠ বিদ্যা, এবং 'কঙ্গো-নো-সান' বা চীনা স্তোত্রপাঠ বিদ্যা। এ বিষয়ে সিঙ্গন সম্প্রদায়ের বক্তব্য :

> The type of Buddhism which evaluates music and dance most positively is Mantrayana (Esoteric Buddhism, Jp. mikkyo), which developed in India (in) seventh century C.E. Its origins are traditionally explained in the following way Vajrasattva received the Mantrayana teachings directly from Mahavairocana, the cosmic or absolute Buddha, compiled them as scripture, and sealed them in an iron tower in south India. This tower was opened; it is beleived, eight hundred

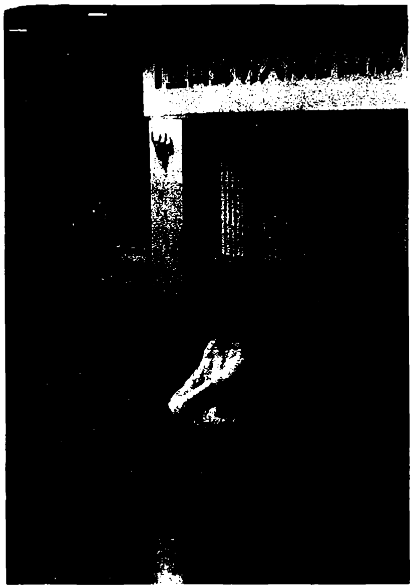

জাপানের রিগা রয়্যাল হোটেল সৌম্যসংগীত গ্রন্থ প্রকাশনা অনুষ্ঠানের বাউলগান পরিবেশন করছেন লেখক। ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

> years after the demise of Sakyamuni by Nagarjuna, who then revealed the long-hidden scriptures. These sriptures were brought to China by Vajrabodhi (Jp. Kongochi), Subhakarasimha (637-735), Jp. Zenmui), and Amoghavajra (705-74, Jp. fuku). (...) Mantryana was transmitted to Japan at the beginning of the ninth century by Japanese priests who studied in China, and played an important part in the formation of the two most important Japanese Buddhist sect. the Tendai sect, whose teaching are centered around the Lotus Sutra (*Jp. Hoko-kyo, Sanskrit-Saddharma-pundarika-sutra*) but also embrace a wide range or earlier and later doctrines, was founded by Saicho (767-822), while the Shingon sect, based almost solely on the esoteric teachings, was founded by Kukai (774-835). Kukai studied under Hui-guo (746-805, Jp. Keika), a disciple of Amoghavajra. He transmitted to Japan the two types of vocal peaces indispensable for ceremonies of the esoteric type, *Bongo no san* (Sanskrit hymns) and *kango no san* (Chinese hymns), and build the foundation of Shingon *somyo*. (Youth-1998, P. 461)

জাপানের প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের বিকাশ নিয়ে যে বক্তব্য উপস্থাপন করা হলো। তার সপক্ষে শশিভূষণ দাশগুপ্তের বক্তব্য অনেকটা মিলে যায়। তিনি চর্যাপদের পটভূমি নির্ণয় করতে গিয়ে মহাযানী মতাদর্শের শূন্যবাদের কথা বলেছেন। জাপানিজ সৌম্য সংগীত সেই পথেরই ধারক। আবার মহাযানী ধারা অন্তর্গত বজ্রযানী-ধারা বিশেষভাবে সিঙ্গন বৌদ্ধগণের অনুসরণীয় পথ। শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন :

> চর্যাপদগুলির মধ্যে যে দার্শনিক পটভূমিটি গৃহীত হইয়াছে সেই পটভূমিটি মোটামুটিভাবে মহাযান বৌদ্ধধর্মের অন্তবর্তী বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতগুলি দ্বারাই গঠিত। মহাযান বৌদ্ধধর্মের অন্তর্বর্তী মতগুলির মধ্যে দুইটি মতকে প্রধানভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে—একটি হলো নাগার্জুনপাদ প্রবর্তিত শূন্যবাদ বা মাধ্যমিকবাদ, অপরটি হলো মৈত্রেয়, অসঙ্গ, বসুবন্ধু প্রবর্তিত বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচারবাদ।' (শশিভূষণ, ২০০৪ : পৃ. ৫২)

ক্যারিইওবিঙ্গা বুদ্ধিস্ট রিসার্চ সোসাইটি সিঙ্গন সম্প্রদায়ের প্রধান চর্চাকেন্দ্র। সেখান থেকে প্রাপ্ত গ্রন্থমতে 'বঙ্গ-নো-সান' সূত্রসমূহ এই বঙ্গেরই কি না তা এখনি নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। তবে সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি নামে যে সূত্রগুলো রয়েছে, সেখানে ৩৭টি সংস্কৃত ও চীনা সুরের উপাস্যগাথা যুক্ত হয়েছে, তাতে ২৯টি বজ্রদেবতার নামে স্তোত্রপাঠের সুর সংরক্ষিত আছে। সিঙ্গন সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণ সুরসমূহ নিয়মিত পরিচর্যা ও পরিবেশন করে থাকেন। জাপানি উচ্চারণ অনুসারে দেবতাগণের

নামসমূহ হলো বজ্রপারমিতা, বজ্রসত্ত্ব, বজ্ররাজা, বজ্ররাগ, বজ্রসাধু, বজ্ররত্ন, বজ্রত্যেজ, বজ্রকেতু, বজ্রহস্ত, বজ্রধর্ম, বজ্রতীক্ষ্ণ, বজ্রহেতু, বজ্রভাষা, বজ্রকর্ম, বজ্ররক্ষা, বজ্রযক্ষ, বজ্রমুষ্টি, বজ্রলাস্যি, বজ্রমালা, বজ্রগীতা, বজ্রনৃত্য, বজ্রধূপ, বজ্রপুষ্প, বজ্রদীপ, বজ্রগান্ধ্য, বজ্রঅঙ্কুশ, বজ্রপাশ্য, বজ্রস্ফোট্য এবং বজ্রঘণ্টা। এ থেকে প্রমাণিত হয় এগারোশত বছর পূর্বে সিঙ্গন সম্প্রদায় চীন থেকে প্রাপ্ত ভারতীয় সংস্কৃত বজ্রযানী তান্ত্রিকগান এবং মন্ত্র সংগ্রহ করেছিল। তা এখনো জাপানের প্রাচীন মন্দিরসহ প্রায় পনের হাজার মন্দিরে গীত হয়। চর্যাগীতিও বজ্রউপাস্য ধারা। অতএব এই তথ্যসূত্র অনুসরণ করেও প্রাচীন সুরের কাঠামোকে নির্ধারণ করার সুযোগ রয়েছে। জাপানি গ্রন্থে উল্লিখিত সূত্রসমূহের মধ্য থেকে বজ্রসত্ত্ব মন্ত্রটি নিম্নরূপে প্রদর্শন করা হলো :

vajra-sattva maha sattva	বজ্রসত্ত্ব মহাসত্য
vajra sarva-tathagata	বজ্র সর্ব-তথাগত
samanta-bhadra vajra adya	সামন্তভদ্র বজ্রআদ্য
varja-pane namo ‘stute’.	বজ্রপাণি নমস্তুতে॥
(Youth, 1998 : 46)	

নিম্নরূপ এই বজ্রসত্ত্ব মন্ত্রটির প্রাচীন চীনা স্বরলিপি এবং অনুসৃত বাংলা আকারমাত্রিক স্বরলিপিতে অংশবিশেষ প্রণয়ন করা হলো।

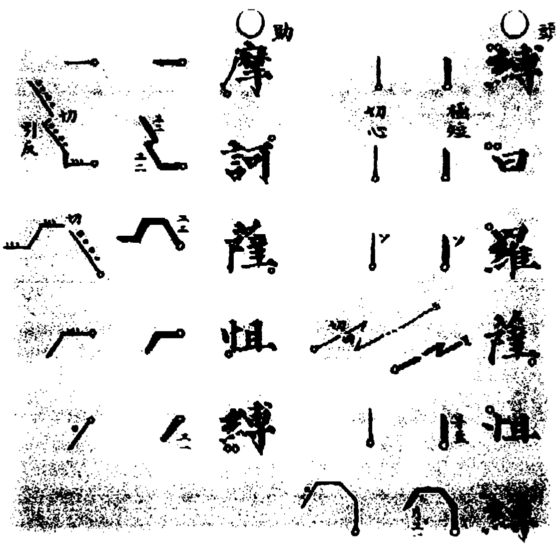

প্রাচীন চীনা স্বরলিপি স্বরলিপি চিত্র-৫.১

Tobo no san বা (বজ্রসত্ত্ব)-এর বাংলা আকারমাত্রিক স্বরলিপি

পা-া ০ গা গা-া-া-া প্া-া্ গা-া-া-া-া-া-া-া ০০০০ গা-া-া-া-া-া-া-া

বা... জ্জা...রা.......... সা.......আ..................... আ.............

ক্ষাগা-া-া-া রা-া-া-া ক্ষাগা-া-া-া-া-া রেগা-া রেগা রেগা-া-া-া রা-া গা-া গা-া-া-া

....তো.........বা......

রা-া ন্া-া ধ্া-া-া-া-া-া-া-া নাধ্া-া-া-া-া-া-া ০০০০ প্া-া-া-া-া

.... মা...........

ধাপ্া-া ধাপ্া ধ্া-া-া-া প্া-া-া-া-া-া ধাপ্া-া ধাপ্া ধ্া-া ন্া-া ধ্া-া-া-া-া-া-া-া

............................কা..

নাধ্া-া-া-া নাধ্া-া-া-া-া-া-া-া নাধ্া-া-া-া নাধ্া-া-া-া-া-া-া-া নাধ্া-া-া-া-া-া-া-া ০০০০

....

প্া-া ধ্া-া-া-া-া-া-া-া নাধ্া-া-া-া নাধ্া-া-া-া-া-া-া-া নাধ্া-া-া-া নাধ্া-া-া-া-া-া-া-া ০০

আ..

প্া-া ধ্া-া-া-া-া-া-া-া নাধ্া-া-া-া নাধ্া-া-া-া-া-া-া-া নাধ্া-া-া-া নাধ্া-া-া-া-া-া-া-া ০০

সা..

প্া-া-া-া-া-া ধাপ্া-া ধাপ্া ধ্া-া-া-া গ্া-া-া-া-া-া পাগ্া-া পাগ্া ধ্া-া-া-া প্া-া-া-া-া-া

আ.. তো........

ধাপ্া-া ধাপ্া ধ্া-া-া-া র্া-া র্া-া গ্া-া-া-া পাগ্া-া-া-া-া-া-া-া ০০০০

.... ও.... বা...

প্রাচীন চীনা স্বরলিপি থেকে আকারমাত্রিক স্বরলিপি রূপান্তর, চিত্র-৫.২

নমূনা-স্বরলিপির মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে তৎকালীন সংগীতে পাঁচটির অধিক স্বর ব্যবহৃত হয় নি। স্বরসমূহ G, A, B, D এবং E, বা পা, ধা, নি, রে এবং গা স্বরের মধ্যে বাঁধা। ক্ষেত্রবিশেষে শার্পনোট ব্যবহৃত হয়। পঞ্চস্বরিক এই সংগীত ধারা প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ থেকে চীন ও জাপানে সংরক্ষিত হয়েছে, তা চীনের প্রচলিত স্বরলিপির মাধ্যমে সংরক্ষিত ছিল। সৌম্যসংগীতগুলো যে বাংলা চর্যাগীতির থেকেও প্রাচীন তা জাপানিজ বৌদ্ধ কুকাই-এর সময়কাল থেকে প্রমাণিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রাপ্ত চর্যাগীতের সুরের সাথে এর মিল ছিল কি না তা প্রমাণ করা এখনো অসাধ্য। বজ্রযানী মন্ত্র ও তান্ত্রিক ধারার পরিবাহক হিসেবে এই সুরচিত্রগুলো আকর ও আদিসূত্রকে ধারণ করে আছে। প্রবোধচন্দ্র বাগচীর বক্তব্যে যে ফরাসি মনীষী সিলভাঁ লেভির বক্তব্য উঠে এসেছে, তা এই সংগীত সমূহের বিকল্প নয়। ২৮টি বজ্রসূত্রের নাম উল্লিখিত হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ সুর আদি চীনা স্বরলিপি এবং বর্তমানে স্টাফ নোটেশনের মাধ্যমে সেই সাথে কোইজুমা ইউসো ও অন্যান্য পুরোহিতগণের মাধ্যমে অডিও ধারণপূর্বক বৌদ্ধ গবেষণা ইনস্টিটিউটসমূহ দীর্ঘদিনের গবেষণার মাধ্যমে সংরক্ষণ করে রেখেছে।

জাপানে প্রাপ্ত সৌম্যগুলোর সাথে চর্যার কতটা সম্পর্ক রয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে নয়টি 'যান' সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক। আদি ও আসল তিনটি যান হলো শ্রাবকযান, প্রত্যেকবুদ্ধযান ও বোধিসত্ত্বযান। বৈদিকতন্ত্রের পথ ধরে রয়েছে আরো তিনটি যান হলো ক্রিয়াযান, চর্যাযান ও যোগযান। এবং শক্তিশালী গতিশীলতার পদ্ধতি অনুসারে শেষ তিনটি যান, তাহলো মহাযোগযান, অনুযোগযান এবং অতিযোগযান।

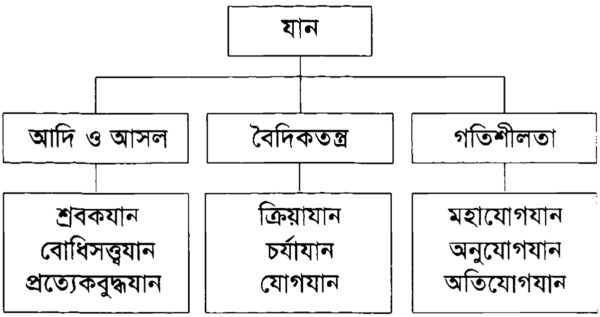

এ বিষয়ে তিব্বতি গবেষক অলোক যেঙ্কার রিনপোছ থুবতেন নিইমা বলছেন :

> The Vehicle of Charya or 'conduct' tantra is so-called because it places an equal emphasis on the other actions of body and speech and the inner cultivation of samadhi. It is also called the 'tantra of

both' (উভয়তন্ত্র) because its view conforms with that of yoga tantra, while its conduct is sismilar to that kriya. (lotsawahouse.org)

জাপানি সৌম্য সংগীত হলো প্রথম পর্বের তিন নম্বর যান বা বোধিসত্ত্ব বাহনের চর্চাধারা যেখানে চূড়ান্তসিদ্ধির কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ উভয়ের পথ ভিন্ন। তা সত্ত্বেও সেই সময়ের সুর অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, বিষয় ভিন্ন হলেও তন্ত্রপাঠের সুর খুব একটা ভিন্ন ছিল না। চাইনিজ বুদ্ধিস্ট এনসাইক্লোপেডিয়াতে অবশ্য ভিন্নকথা বলা হয়েছে। সেখানে বোধিসত্ত্বের মহাবৈরোচনতন্ত্রকেই প্রধান চর্যাতন্ত্র বলা হয়েছে। অর্থাৎ–

> The main Charya Tantra is Mahavairocanabhisambodhi Tantra (tathagata lineage), in Japanese it is callaed Dainichikyou. (...) The Charya class of Tantras holds the smallest number of texts of all the traditional classifications of tantric literatures. An important tantra in this class is the Mahavairocana Sutra. (...) this class of literature was important to kukai (774-835) and the development of Shingon Buddhism. (chinabuddhismencyclopedia.com)

চিকিয়্য ইয়ামামোতো অনূদিত ৭২৫ সালের চীনা লেখক Subhakarasimha and 1-hsing (A.D. 725)-এর Mahavairocana-Sutra গ্রন্থে লোকেশ চন্দ্রের লেখা ভূমিকায় একই ধরনের বক্তব্য রয়েছে:

> It is noteworthy that the Enlightenment of Vairocana is abhisambodhi with the prefix abhi- in the sense of intensifying the action implied in the basic word bodhi. It denotes the highest enlightenment, that is, a more evolved concept of bodhi. Abhisambodhi is specifically applied to Vairocana of the carya-tantras. (Chikyo, vii)

চিকিয়্য এর মতামত থেকে অনুসন্ধান চালালে সিঙ্গন সম্প্রদায়ের মহাবৈরোচন সূত্রগুলো চর্যাসংগীতেরই প্রধান একটি অংশ; যা ৮০৪ সালে চীন থেকে সুর সহযোগে সংরক্ষিত হয়েছে সিদ্ধাচার্য কিউকাইয়ের মাধ্যমে। সিঙ্ঘন সম্প্রদায়ের কাছে বর্তমানে এই চর্যাগীতের সংখ্যাও কম নয়। এর মধ্য থেকে একটি সূত্র 'কিক্য-ন-বঙ্গ' বা 'দৈনন্দিন জীবনের মঙ্গলগাথা' উপস্থাপন করা হলো :

> Yan mangalam tusita-deva-vimana-garbhad
> Asid iha vatarato jagato hitaya
> Sa-indraih susair anugatasya tathagatasya
> tan mangalam bhavatu santi-karam tavadya. (Buzan, 2006 : 310)

অর্থাৎ জনমঙ্গলম তুষিত-দেব-বিমণা-গর্ভদ
অসিদ্ধবিতারত জগত হিতয় ।
সৈন্দ্রাইহ সুষাইর আনুগতস্য তথাগতস্য
তানমঙ্গলম ভাবতু শান্তিকরমতাবদ্য॥

যদিও এগুলোকে এখনো কেউ চর্যাগীতি হিসেবে সাব্যস্ত করেননি তবে ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসের প্রাচীনরূপ (সিলভাঁ লেভির বক্তব্যানুসারে) হিসেবে এই গীতিসম্ভারকে বজ্রগীতি বলা হলে সন্দেহ থাকে না। বজ্রগীতি গাওয়া হতো গুহ্যসাধন, যোগাসন, কর্মে এবং তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে 'মঙ্গলচক্রে' আনুষ্ঠানিক স্তবগান রূপে। বজ্রসত্ত্বকে জাগিয়ে তোলাই বজ্রগীতির কাজ। এতে চর্যাগীতির ন্যায় ভণিতা নেই। রচনাকারের আত্মনির্লিপ্ততার মধ্যদিয়ে ও মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হয়। এটি সংস্কৃত হলেও তা বাংলা ভাষারও অংশ বা পূর্বরূপ কী না তা বিবেচনা করবেন ভাষাতাত্ত্বিকগণ। তবে অসংখ্য বজ্রগীতি অবহট্‌ঠ বা তার কাছাকাছি ভাষায়ও রচিত হয়েছে।

চর্যাগীতি যারা গাইতেন এবং রচনা করতেন তারাই বজ্রগীতি গাইতেন এবং রচনা করতেন। ফলে সুর ছিল সমানুবর্তী। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বলেন, 'এক সময়ে গৌড়-বঙ্গে বজ্রযান বৌদ্ধদের খুবই প্রতিপত্তি ছিল। এই সম্প্রদায় বজ্রসত্ত্ব নামক ষষ্ঠধ্যানী বুদ্ধ ও বজ্রধাত্বীশ্বরী বা ব্রজ্রেশ্বরী নামক শক্তির কল্পনা করেন। তাহারা প্রধান প্রধান প্রচারকেন্দ্রগুলিতে বজ্রসত্ত্ব ও বজ্রেশ্বরী মুর্তি প্রতিষ্ঠা করতেন।' (উপেন্দ্র : ১৪০৮, ৩০)

তবে বজ্রগীতির সাথে মুদ্রার প্রয়োগ প্রত্যক্ষ ছিল। চর্যার সাথে বাদ্য ও বিনোদনমূলক, শিক্ষা বা উৎসাহমূলক দিকটি রক্ষা করা হতো। সুকুমার সেন এ বিষয়ে বলেন– 'চর্যাগীতির অনুরূপ ছিল বজ্রগীতি। চর্যাগীতি উৎসবে ও অবসরবিনোদনে গাওয়া হইত, যেমন আধুনিক বাউল-কর্তাভজারা করে। বজ্রগীতি গাওয়া হইত গুহ্য যোগকর্মে ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে।' (সুকুমার, ১৯৯৫ : ৩১)। জাপানে প্রতিষ্ঠিত সৌম্যগীতিসমূহ চর্যাগীতি হোক অথবা না হোক, তা এতদঞ্চলের প্রাচীন এমনকি চর্যাকাল কিংবা তার পূর্বকালীন সাহিত্য নিদর্শন, যা বাংলা ভাষাভাষীর পক্ষে পাঠানুশীলন সহজ। আবার আরেকটি দিক উক্ত পদের মধ্যে থেকে আলোচনার দাবি রাখে, তাহলো এই সংগীত মার্গসংগীত কি না। যেহেতু এই গীতগুলো নাগার্জুনের[১০] সমকালের এবং ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের বলা হচ্ছে। সংগীতগুলো মঙ্গল স্তোত্রগাথা। মার্গ ও দেশী সংগীত সম্পর্কে 'সংগীত রত্নাকরে'র তেইশতম শ্লোকে বলা হয়েছে :

দেবস্য পুরতঃ শম্ভোর্নিয়তাভ্যূদয়প্রদঃ।
দেশে দেশে জনানাং যদরুচ্যা হৃদয়রঞ্জকম॥

অর্থাৎ যা নিয়ত ও মঙ্গলজনক তাকেই মার্গ-সংগীত বলে। যে গীত-বাদ্য-নৃত্য অঞ্চলভেদে, সম্প্রদায় ও জনসাধারণের অভিরুচি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে মনোরঞ্জক হয় তাকে দেশী সংগীত বলে (প্রদীপ, ১৯৯৪ : ৪)। সেক্ষেত্রে চর্যাগীতের আরেকটি ধারা মার্গসংগীতের ধারায় বিকশিত ছিল কি না, সে দিকটিও আলোচনার দাবি রাখে।

প্রবন্ধের সূচনাতে বলা হয়েছে, দেশীগানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তা ক্রীড়াত্মক প্রধান এবং নিজস্ব লক্ষ্য বা লক্ষণ ত্যাগ করলে কোনো পাপ হয় না এবং এই গান সর্বসাধারণের জন্য গীত। যেমন ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া ইত্যাদি। কিন্তু চর্যাগীতি শুধু যে গাওয়াই হতো তা নয়, বরং নৃত্য সহযোগে তা পরিবেশন করা হতো। আবার তা একইসাথে মঙ্গলজনক, কিন্তু জনসাধারণের অভিরুচিভেদে মনোরঞ্জক। আধুনিক যুগের সাথে সেই সময়কালের ব্যবধান হলো, তখনকার নৃত্যের উদ্দেশ্য ছিল নাটক বা গীতের পূর্ণভাবকে উপস্থাপন করা। অতএব বোঝা যাচ্ছে সাধারণ লোকসংগীতের মতো এটি দেশি গানের মতো ছিল না সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল না। তান্ত্রিক ও সাধনমার্গের সহায়ক হিসেবে চর্যাগীতি গাওয়া হতো। দেশি গানের বিকাশ সাধারণের জীবন-যাত্রার অনুকূলে বিনোদনমূলক ধ্যান-ধারনায় বিকশিত হয়, কিন্তু চর্যাগীতি ছিল এক ধরনের গুপ্তবিদ্যার অনুকূল চর্চা। অতএব এই গানকে কোনো প্রকারভেদেই টেনে নেওয়া সম্ভব নয়। মন্ত্র বা তন্ত্রচর্চার সাথে মার্গ সংগীতের যে মিল পাওয়া যায়, চর্যার সাথেও কিছু মিল রয়েছে পরিবেশনের অবস্থান ও শৃঙ্খলার দিক থেকে। কিন্তু মার্গসংগীত পৃষ্ঠাপোষকতার দ্বারা চলতো, চর্যাগীতি কখনোই সেই সুযোগ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অতএব এই গানকে সরাসরি মার্গসংগীত বলাও অবান্তর। তবে এই গানকে প্রকীর্ণ শ্রেণির গান বলার সঙ্গত কারণ রয়েছে। অর্থাৎ আঞ্চলিক কৃষ্টির প্রতি সংবেদনশীল হলেও তা আঞ্চলিক ভাষা-গানের ভঙ্গি এবং পরিবর্তনশীলতার প্রবাহে বিকশিত হয়নি। আবার মার্গসংগীতের মতো বৈজ্ঞানিক অনড় নিয়মকানুন পালনের পক্ষেও থাকেনি।

১৯৬৩ সালের দিকে অধ্যাপক শশীভূষণ দাশগুপ্ত লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আর্নল্ড বকের কাছ থেকে বিশটি চর্যাপদ টেপ রেকর্ডারে তুলে আনেন। ড. বিজন বিহারী ভট্টাচার্যকে তিনি ২৫শে মার্চ ১৯৬৩ সালে প্যারিস থেকে বলেন :

> একটি অত্যন্ত শুভ সংবাদ আছে। নেপালে মুখে মুখে বজ্রাচার্যগণ এখনও চর্যাসংগীত গান করেন। এ জাতীয় প্রায় কুড়িটি সংগীত লন্ডন হইতে যোগাড় করিয়াছি। স্থানে স্থানে চর্যাগুলির সঙ্গে পঙক্তিতে পঙক্তিতে মিলিয়া যায়। একই ভাব ও ভাষা। গানগুলিও সংগ্রহ করিয়া আনিয়েছি। (অতীন্দ্র, ১৯৯৫ : ১৩)

একথারও সত্যতা মেলে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মধ্যদিয়ে। ২০০৯ সালে চর্যাগীতির সুরানুসন্ধানে নেপালে যাত্রায় কয়েকটি সুরের সন্ধান পাওয়া যায়,[১১] এ সম্পর্কে পূর্বেই

তথ্য প্রদান করা হয়েছে। সেখানে প্রাপ্ত সুরসমূহের মধ্যে চার নম্বর চর্যার সুরসহ আরো কিছু বজ্রমন্ত্র, হেবজ্রতন্ত্রের গায়ন এবং কিছু চর্যায় ব্যবহৃত তাল শোনার সৌভাগ্য হয়। এতে যে ধরনের সুর লক্ষ্য করা যায় তা মূলত ঐতিহ্যবাহী মন্ত্রপাঠের সুর, যা একেক অঞ্চলে একেক রকমের আঞ্চলিকতায় বিকশিত। তবে চর্যাগীতির সাথে যেহেতু বজ্রযানী ধারার সম্পর্ক, সে সূত্রে হেবজ্রতন্ত্রের সুর চর্যার ভিতরে প্রবাহিত, এই লক্ষ্যে অন্বেষণ করে দেখা হয়েছে, চর্যাগীতিতে যে রাগরাগিণীর ব্যবহার রয়েছে, তার সাথে এই সুরগুলোর মিল পাওয়া যায় না। পটমঞ্জরীর কথাই ধরা যাক, যে রাগে ১২টি চর্যাগীতি গাওয়া হতো। সেই রাগেরও সন্ধান মেলেনি নেপালের শ্রুত সংগীতে। তাছাড়া চর্যায় যে সকল রাগের নাম রয়েছে সেখানে বিশেষভাবে বঙ্গের নিজস্ব কিছু রাগের নাম রয়েছে। সেগুলোর সাথেও কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি।

রাগ-রাগিণীর ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রথম থেকে পঞ্চম দশকের মধ্যে মতঙ্গের *বৃহদ্দেশী* গ্রন্থে আভীরী, চ্ছেবাটী, গুর্জরী, পুলিন্দিকা, শবরী, দ্রাবিড়ী, সৈন্ধবী, পৌরালী, বঙ্গালী, টক্ক বা ঠক্ক, কৈশিকী প্রভৃতি রাগগুলিকে অভিজাত বলে গণ্য করা হয়েছে। এর মধ্যে গুর্জরী, শবরী ও বঙ্গালী, মালসী, ভৈরবী, মল্লারী রাগের সাথে এতদঞ্চলের নাম ও লোকসংগীতে প্রচলনের ভিত্তি হিসেবে ধারনা করা যায়। চর্যাকারগণ বিশেষ মতবাদে আসক্ত সাধক ও তার প্রচারক হিসেবে যা লিখেছেন তা বাংলার নিজস্ব প্রকৃতিরই ভাব দর্শন ও সুর। কীর্তন এবং মেয়েলিগীত কালের আবর্তে তার সুরভঙ্গির বিবর্তিত হলেও তা বিকৃত ও মিশ্রিত হয়নি, ফলে এই সুরবৈশিষ্ট্যেও মধ্যেও প্রাচীন চর্যার সুররূপ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। চর্যারচয়িতাগণের অধিকাংশই অতি উঁচু পর্যায়ের, ফলে তাঁদের মৌলিক কোনো সুরকেই কোনো একজন সংকলক হয়তো একত্রিত করেছিলেন। যেহেতু 'নৃত্যগীত পরিবেশনের' জন্য সিদ্ধাচার্যদের পদগুলো তুলোট কাগজে নকল করা হতো। সেখানেই লিপিকার সুরের চলনকে স্মরণে রাখবার জন্য রাগ ও রাগিণীর নাম এবং একটিতে তালের নাম ব্যবহার করেছিলেন।

আরেকটি প্রধান দিক হলো কয়েকটি গানের মধ্যে নির্দিষ্ট বাদ্যের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। সেই বাদ্যসমূহ আঞ্চলিকতাকে এবং বিশেষ নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক নিজস্বতাকে উপস্থাপন করে। আবার কিছু রাগ মার্গসংগীতের ধারাকে নির্দেশ করে। ফলে জাপানের 'সৌম্য' বজ্রধারায় যে দক্ষিণ ভারতের নাগার্জুনের শূন্যতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে, সেই অঞ্চল অন্বেষণ করেও সুরের একটি ক্ষেত্র উন্মোচন করা সম্ভব। আবার হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, 'গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্তনের মতো, গানের নাম চর্যাপদ। সে-কালেও সংকীর্তন ছিল এবং কীর্তনের গানগুলিকে পদই বলিত। তবে এখনকার কীর্তনের পদকে শুধু পদই বলে, তখন চর্যাপদ বলিত' (অতীন্দ্র, ১৯৯৫ : ১৭)।

একথার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন জাগে কীর্তনের মধ্যে যে সহজিয়া রূপ পরিগ্রহ করে, সেখানে সহজিয়া মতানুসারী চর্যাকারদের ক্ষেত্রে সম্ভবপর হতে পারে। কিন্তু চর্যাকারগণতো আরো অন্য ধারাস্রোতে অর্থাৎ যেমন মহাযান, মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান ইত্যাদি ধারার সাথেও সম্পর্কশীল ছিলেন। এছাড়া চর্যার প্রত্যেক গানে ধ্রুবপদের ব্যবহার রয়েছে, ফলে তা ধ্রুবপদনির্ভর অন্যান্য বৌদ্ধস্তোত্র সৌম্য শব্দবিদ্যার পাঠের মতোও হতে পারে। যে বিদ্যা সুরের আলংকরিকতায় প্রতিষ্ঠিত না হয়ে ধ্বনিচিত্রের উৎপাদনে প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া চর্যা শুধু বাংলা অঞ্চলের নয় বরং এশিয়া মহাদেশে প্লাবিত একটি ধারা। একটি চলমান, নব নব রচনার ভিতর দিয়ে মৌখিক রচনার গুণে গুরুশিষ্য পরম্পরায় বিকশিত। বিভিন্ন ভাষায়ও চর্যা রচনার প্রমাণ মেলে। শ্রীজ্ঞান অতীশও চর্যা রচনা করেছিলেন তিব্বত ভাষায়, অথবা তা তিব্বত ভাষায় অনূদিত হয়েছিল তৎকালেই। অতএব লোক-প্রচলিত সুরের থেকে প্রাচীন মন্ত্র ও স্তোত্রপাঠের বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে অক্ষত থাকার সম্ভাবনা বেশি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কীর্তনের সাথে চর্যার সুর মিলাতে গিয়ে আরো একটি বিষয় উত্থাপন করেছেন, 'চৈতন্যদেবের অন্তত ছয়শত বছর পূর্বে ভারতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ সংকীর্তনের গান বেঁধে ও নানা রাগ-রাগিনীতে ঐ সমস্ত গান গেয়ে ভারতবাসীর মন বৌদ্ধধর্মের দিকে আকৃষ্ট করতেন।' (মীনাক্ষী, ২০১৩ : ৪২)। কিন্তু গণসংকীর্তনের সাথে চর্যাকে মেলানো ঠিক হবে না, কারণ তা গুপ্তচর্চার অংশ। তবে সংকীর্তনের সাথে চর্যার রাগরাগিণীর প্রবহমানতার সাথে সাদৃশ্য থাকলেও থাকতে পারে।

সম্প্রতিকালে চর্যাগীতির সুরান্বেষণ বা সুরসৃষ্টির ক্ষেত্রে আগ্রহশীল অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সংগীতানুগ্রাহীদের অনেকেই চর্যার নানামুখী সুর প্রদান করে মঞ্চে-মিডিয়ায় তা পরিবেশন করে আসছেন। প্রত্যেকেই মূলসুরের প্রামাণ্য হিসেবে রাগ-রাগিণীকেই অনুসরণ করছেন। তবু কারুর সুরই স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং মতপার্থক্যের ভিতর দিয়ে নানামুখী সাংগীতিক গবেষণায় উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলা চর্যাগীতির সুরান্বেষণ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণ উপাত্ত বিশ্বসংস্কৃতিতে মিশে আছে। কারণ ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সংগীত এবং সেইসাথে বৌদ্ধদর্শন ও সংস্কৃতি এখনো দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে প্রচলিত। বাংলার পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে বার্মা, থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া, জাপান, কোরিয়া, চীন ইত্যাদি অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে প্রাচীন সুরের কাঠামোকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। সংগীত নৃ-বিদ্যার আওতায় মৌলিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে তার মূলধারা শনাক্ত করা সম্ভব।

চর্যাগীতের দার্শনিক বক্তব্য এখনো বাংলার বাউলগান, কীর্তন ও দোহাগীতি এমনকি নাথগীতিকায় বিবর্তিত রূপে দেখা যায়। এখনো ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আরো অসংখ্য চর্যাগীতি প্রচলিত রয়েছে। হরপ্রসাদশাস্ত্রীর পরে শশিভূষণ দাশগুপ্ত, রাহুল

সংকৃত্যায়ন, আর্নল্ড বাক, জগন্নাথ উপাধ্যায়, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ নানা পর্যায়ে তার নিদর্শন চাক্ষুষে এনেছেন। ২০০৯ সালে আমাদের পক্ষ থেকেও কিছু 'নব-চর্যাপদ'[১২] উদ্ধার করা সম্ভব হয়। পরবর্তীকালের কোনো কোনো চর্যা ও বজ্রগীতিতে রাগ-রাগিণীর সাথে তালেরও সন্ধান পাওয়া যায়। এঁদের কেউ কেউ প্রত্যক্ষ গাওয়া শুনে থাকলেও তার সুর ধারণ করা বা স্বরলিপিকরণের প্রমাণ প্রদর্শন না করার কারণে চর্যার মৌলিক সুরঅন্বেষণের পথ এখনো দুর্গম। অনেকে ভাষা, সাহিত্য ও দর্শন বা মতবাদ-আশ্রিত রূপরেখায় গবেষণা ও পর্যালোচনা করেছেন; কিন্তু চর্যার সাথে সুর, নৃত্য ও নাট্য সহযোগ এখনো অনাবিষ্কৃত বলে চর্যা পরিবেশনা শিল্পের আবশ্যকীয় পাঠ করে তোলা সম্ভব হয়নি। সেকারণে গবেষণা জগৎ খণ্ডিতভাবে মূল্যায়িত হয়েছে। সুকুমার সেনের বক্তব্য অনুসারে–

> চর্যাপদের সাধনার ধারা বাহিরের দিকে অবলুপ্ত হইলেও ভিতরে ভিতরে প্রবহমাণ ছিল। সে সাধনার উত্তরাধিকারী ষোড়শ ও পরবর্তী শতাব্দীর রাগানুগ বৈষ্ণব ও মরমিয়া "সহজ" সাধকেরা। ইহাদের মধ্যে যে প্রাণী চর্যাগীতির স্মৃতি নিঃশেষে মুছিয়া যায় নাই তাহার প্রমাণ, একটি প্রায় অখণ্ড চর্যাগীতি অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা বাঙ্গালা পুথিতে কবিরের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে।' (সুকুমার, ১৯৯৫ : ৪১)

ঠিক একইভাবে লালন সাঁই ও তার উত্তরসাধকদের ভাবসঙ্গীতেও চর্যার ভাবতত্ত্ব, সান্ধ্যভাষার নিদর্শন ও রূপক শব্দের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা গেছে। অতএব বাংলার আদি সাধনার ধারায় যাঁরা সম্পৃক্ত; সহজিয়া, তান্ত্রিক ও বৌদ্ধদর্শনের রূপরেখায় প্রতিশ্রুত সাধক-কুলের সংগীতে চর্যার ব্যাখ্যা নবসংগীতের সৃজনশীলতায় উন্মেষিত হতে পারে। সেই পথ নাথধর্মী, বাউল, বৈষ্ণব ও শাক্তকবিরা অবলীলায় উন্মুক্ত করে গিয়েছেন।

টীকা

১ Importantly, during the Charya tantra class and literary period, there developed the salient innovation wherein the *sadhaka* is to cultivate identification with the deity in meditative absorption. (chinabuddhismencyclopedia.com)

২ চর্যাপদের ভিতরে প্রতিফলিত হইয়াছে যে বাঙলাদেশ তাহা নিম্নব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম পার হইতে আরম্ভ করিয়া উড়িষ্যার কিয়দংশ এবং কামরূপ বা বর্তমান আসামের কিংদংশ লইয়া একটি বৃহৎ ভূভাগ। (শশিভূষণ, ২০০৪ : ৮৩)

৩ মতঙ্গের বৃহদ্দেশী গ্রন্থটি ৬ষ্ঠ শতকের রচিত অনুমান করা হয়, যা সংগীতের নানা তাত্ত্বিক দিক বিশ্লেষণ এবং রাগ-রাগিণীর প্রাচীন শাস্ত্র। এতে দেশী ও মার্গসংগীতের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে এবং নাদোৎপত্তি ও স্বরপ্রকরণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

৪ চর্যাপদগুলির মধ্যে যে দার্শনিক পটভূমিটি গৃহীত হইয়াছে সেই পটভূমিটি মোটামুটিভাবে মহাযান বৌদ্ধধর্মের অন্তবর্তী বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতগুলি দ্বারাই গঠিত। মহাযান বৌদ্ধধর্মের অন্তর্বর্তী মতগুলির মধ্যে দুইটি মতকে প্রধানভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে–একটি হলো নাগার্জুনপাদ প্রবর্তিত শূন্যবাদ বা মাধ্যমিকবাদ, অপরটি হলো মৈত্রেয়, অসঙ্গ, বসুবন্ধু প্রবর্তিত বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচারবাদ। (শশিভূষণ, ২০০৪ : ৫২)

৫ হর্ষচরিতে উল্লেখ আছে 'গুর্জর-প্রজাগণঃ...প্রভাকরবর্ধনোনামরাজাধিরাজঃ' (হর্ষচরিত ৪র্থ উচ্ছ্বাস)। প্রথমে ভারতে প্রবেশ ক'রে গুর্জররা ভারতীয়-নৃপতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহ করতো। ক্রমে তারা ভারতীয়-সমাজে বাস করতে করতে ধীরে-ধীরে ভারতীয়-সমাজের মধ্যে মিশ্রিত হয় ও স্থায়ীভাবে ভারতের উপনিবেশ স্থাপন করে। (প্রজ্ঞানানন্দ, ১৯৮৬ : ১৫১-৫২)

৬ কাহ্নপার প্রকৃত নাম কৃষ্ণাচার্য পাদ। চর্যাপদের কবিগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। পালরাজ দেবপালে রাজত্বকালে (আনু. ৯০০-৫০) তিনি বর্তমান ছিলেন। পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারে তিনি অবস্থান করতেন। তিনি বৌদ্ধ সহজিয়া মতের অনুসারী ছিলেন। (en.banglapedia/kahnapa)

৭ 'মহাভারতের সভাপর্বে অঙ্গ ও বঙ্গদেশকে একটি রাজ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অঙ্গদেশের রাজধানীর নাম চম্পা এবং চম্পারাজ্য গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত ছিল।' (প্রজ্ঞানানন্দ, ১৩৫৯ : ৫)

৮ কম্বোজি বা কম্বোজ থেকে খাম্বাজ, এ নিয়ে বিতর্কও রয়েছে। অনেকে মনে করেন এটি ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল থেকে আগত। ড. শ্রী বাৎস্য বলেছেন, Raga Kambhoji from Kambojha (ancient country between Punjab and Balkh). (liquisearch.com)। নীহাররঞ্জন রায় বলেন 'আসামের পূর্ব-সীমান্তের গান্ধার সংলগ্ন একটা কম্বোজ দেশ ছিল, এবং বাংলার কম্বোজ রাজবংশ সেই দেশ হইতে আগত।' (নীহাররঞ্জন, ২০০৪ : ৪০)

৯ ২০০৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি 'বুজান সৌম্য তাইসেই' নামে জাপানের সুবিখ্যাত বৌদ্ধধর্মীয় গুরু কোজিমা ইউসো'র কণ্ঠানুশীলনে অডিও সিডি ও বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য স্বরলিপিকারের প্রচেষ্টায় গ্রন্থ উন্মোচিত হয়। প্রকাশনা উপলক্ষে টোকিও ওয়াসেদা এলাকার রিগা রয়্যাল হোটেল-এর অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা ও বাংলাদেশের বাউল গান নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বৌদ্ধ সিঙগন সেক্ট-এর প্রধান প্রেইস্ট তোরি স্যনিও। এছাড়া হায়াসি রিওকোও, ওনোজুকা কিচৌউ, সুগানো স্যকো, টোকিও আর্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক, নোহ্ থিয়েটার বিশেষজ্ঞ ও মিউজিকোলজিস্ট ইয়োকোমিচি মারিও, স্যচিন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও সংগীতজ্ঞ সোয়েনো চিজুয়ো এবং টোকিও কালচারাল প্রোপার্টিজ ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা সাতো মিচিকো। আলোচনা সভায় প্রায় ২ হাজার বছরের জাপানের বৌদ্ধ-সংগীত চর্চার ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রভাব, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সোমিও'র বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণাসহ বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা ও পর্যালোচনা হয়। এই প্রকাশনার বিশেষত্ব হিসেবে বৌদ্ধসূত্রের প্রাচীন সুরকে যথাযথ

সংরক্ষণের পাশাপাশি বিজ্ঞানভিত্তিক নোটেশনসহ আধুনিক মননে সংস্কার করা হয়, যা জাপানিজ ট্রাডিশনাল মিউজিক-এর অন্যতম প্রধান দলিল হিসেবে মূল্যায়িত হয়। অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিলো আলোচনা শেষে বাংলাদেশের সংগীত পরিবেশন। জয়েৎসু ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও মিউজিকোলজিস্ট মোতেগি কিয়োকো শিল্পী সাইম রানাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, ট্রাডিশনাল সংগীত ও ইন্সট্রুমেন্ট বিষয়ে গবেষণারত সাইম রানা সোমিওসহ অন্যান্য বিষয়ে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন এবং বাংলাদেশের লোকসংগীত এর সাথে তুলনামূলক গবেষণা করছেন।' তবলায় সহযোগিতা করেন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত শিল্পী আবদুর রহমান এবং তানপুরা ও গোপীযন্ত্রে সহযোগিতা করেন জিসিউজি মন্দিরের প্রধান মিঃ সাইতো সেৎসুজিয়ো। এখানে বঙ্গ-এর সন্ধিতে বঙ+গো, ভাষাতত্ত্বের বিচারে 'গো' অর্থ ভাষা, যেমন 'নিহংগো' অর্থ জাপানি ভাষা। তা সত্ত্বেও 'বঙ' শব্দের সাথে বঙ্গীয় ভূমির সাজুয্য থেকে যায়।

[১০] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নাগার্জুনের স্তোত্র নিয়ে তাঁর 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় টীকা-ভাষ্য প্রদান করেছেন।

[১১] ২০০৯ সালে বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী লুবনা মারিয়াম-এর তত্ত্বাবধানে, ওয়ার্দা রিহাব, সাইমন জাকারিয়া এবং আমি চর্যানুসন্ধানে নেপাল ভ্রমণ করি। নেপালের কাঠমুণ্ডুতে অবস্থিত হোটেল বজ্রে রাজেন্দ্র শ্রেষ্ঠ ও তাঁর দল চর্যাগীতি ও নৃত্য পরিবেশন করে অবহিত করেন।

[১২] সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ দীর্ঘদিনের অনুসন্ধানের পর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেকগুলো নতুন চর্যাপদ সংগ্রহ করেছেন। এগুলোকে তিনি 'নব-চর্যাপদ' হিসেবে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। (শাহেদ, ২০১৪ : ১)

গ্রন্থপঞ্জি ও ওয়েবসাইট

অতীন্দ্র মজুমদার (১৯৯৫)। *চর্যাপদ*, নয়া প্রকাশ, কলিকাতা

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৪০৮)। বাংলার বাউল ও বাউলগান, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা

করুণাময় গোস্বামী (১৯৯৩)। *বাংলা গানের বিবর্তন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

নীহাররঞ্জন রায় (২০০৪)। *বাঙ্গালীর ইতিহাস* (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পাস্ কালস চার্লস গোমেজ (১৯৮২)। *রাগরঙ্গ বিলাসিনী*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা

প্রদীপ কুমার ঘোষ ভাষান্তরিত (১৯৯৪)। *নিঃশঙ্ক শার্ঙ্গদেব প্রণিত সংগীত রত্নাকর*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, কলকাতা

মীনাক্ষী বিশ্বাস (২০১৩)। *পরম্পরা : বাংলায় উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্রমবিকাশ*, সপ্তর্ষী প্রকাশন, কলকাতা

মুহম্মদ আবুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত (১৪১৪)। *চর্যাগীতিকা*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা

রাজ্যেশ্বর মিত্র সম্পাদিত (১৩৯১)। *লোচন শর্মা বিরচিত রাগ তরঙ্গিনী*, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা

শশিভূষণ দাশগুপ্ত (২০০৪)। *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কোলকাতা

সুকুমার সেন (১৯৯৫)। *চর্যাগীতি পদাবলী*, আনন্দ, কলকাতা

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ (১৯৮৬)। *ভারতীয় সঙ্গীত : ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক রূপরেখা*, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ (১৩৫৯)। *ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস*, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ (১৯৯৬)। *রাগ ও রূপ*, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ (অক্টোবর ২০১৪)। "*নবচর্যার ধারা*" (প্রবন্ধ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, সংখ্যা ৯৪, ঢাকা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৩২৩)। *বৌদ্ধগান ও দোহা*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা

Buzan Syomyo Taisei (2006). Shingon school Busan sect, Tokyo.

Youth Association of the Buzan Branch of the Shingon Sect (1998). *Buddhist Chant of Shinghi-Shingon: Neumes & Transcriptions Vol. II*, Buzzan Bussei, Tokyo, Japan

Chikyo Yamamoto. Mahavairocana-Sutra, International Academy of Indian Culture and Aditya Ptrakashan, New Delhi

http://www.chinabuddhismencyclopedia.com/en/index.php/charya_tantra_yana

http://www.en.banglapedia/kahnapa

http://www.liquisearch.com/kambhoji/sanskrit_kamboja_vs_cambodia_and_the_raga_kambhoji

http://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/alak-zenkar/nine-yanas

http://www.chinabuddhismencyclopedia.com/en/index.php/charya_tantra_yana